সংক্ষিপ্তসার

ব্রাত্য বসু বাংলা নাট্যসাহিত্য ধারার এক স্বতন্ত্র নাটককার। বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে একবিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্বে অর্থাৎ দুটি শতাব্দীর সন্ধিক্ষণের যে সময়, তখন নাটককার হিসেবে তাঁর আবির্ভাব। ব্রাত্য বসুর জন্ম ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে। এই সময় বাংলা থিয়েটার বহু রদবদলের পর একটি শক্ত জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে গেরাসিম লেবেদফের হাত ধরে বাংলা থিয়েটারের পথ চলা শুরু। তারপর একে একে সৌখিন থিয়েটার, পেশাদারী থিয়েটার, সাধারণ রঙ্গালয়, গণনাট্য, নবনাট্য, মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও বাদল সরকারের অ্যাবসার্ড থিয়েটার ধারা পার করে থিয়েটারের অবিরাম যাত্রা চলছে অবিচ্ছিন্নভাবে। ধীরে ধীরে বাংলায় লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ, নান্দীকার বহুরূপী সহ অসংখ্য নাটকের দলের জন্ম হয়েছে। নাটক ও নাট্যাভিনয় শুধুমাত্র কলকাতা মহানগরে আবদ্ধ না থেকে ছড়িয়ে পড়েছে গোটা বাংলার জেলায় জেলায়। এমন এক সময়ে বাংলা নাটকে নাটককার হিসেবে ব্রাত্য বসুর আগমন। ব্রাত্য বসুকে বলা হয় এক অস্থির সময়ের নাটকের মুখ। তাঁর লেখা প্রথম নাটক হল 'অশালীন'। নাটকটি ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এত অস্থির সময়ের কথা বলতে গিয়ে ব্রাত্য বসু নাটকের বিষয় হিসেবে বেছে নিলেন ভাষার অশালীনতা ও শালীনতাবোধকে। বর্তমানে আনন্দ পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত ব্রাত্য বসুর 'তিন খণ্ড' নাটক সমগ্রতেও প্রথম নাটক হল 'অশালীন'। প্রকাশকাল অনুসারে যদি দেখা যায় তাহলে ১৯৯৬-২০১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই দীর্ঘ ২০ বছরের নাট্যযাপনে তিনি ছোটো এবং বড় নাটক মিলিয়ে মোট আটত্রিশটি নাটক লিখেছেন। এরপরও ব্রাত্য বসু আরো অনেক নাটক লিখেছেন এবং এখনো তিনি অবিরত লিখে চলেছেন। আমরা আশাবাদী ভবিষ্যতেও তিনি আরো নাটক লিখে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধশালী করে তুলবেন। কিন্তু আমার কাজের পরিধি হিসেবে আমি 'ব্রাত্য বসুর নাট্যকৃতি' বিশ্লেষণের জন্য ১৯৯৬-২০১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কালসীমাকে নির্বাচন করেছি। এই দুই দশক ধরে নাট্যকার ব্রাত্য বসু আটত্রিশটি নাটক লিখেছেন। এর মধ্যে আয়তনের বিচার করলে

ছাব্বিশটি বড় নাটক এবং বারোটি ছোটো নাটক রয়েছে। সময় চেতনা ও বিষয়-বৈচিত্র্যে প্রতিটি নাটকই আলাদা করে প্রশংসার দাবি রাখে। প্রকাশভঙ্গী ও নাটকের ভাষা সবসময়ের বাকি নাট্যকারদের থেকে ব্রাত্য বসুকে স্বতন্ত্র স্থান করে দিয়েছে। ব্রাত্য বসু কিশোর জীবনে ছিলেন কবিতা পাগল একজন মানুষ, তার স্বাক্ষর পাওয়া যায় তাঁর নাট্য সংলাপের পরতে পরতে। এক আলো-আঁধারির খেলায়, কুয়াশামাখা পথে চলতে চলতে নাটকের মূল কাহিনি আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়। ব্রাত্য বসুর নাটক সমগ্রের প্রথম খণ্ডের নয়টি নাটক হল নাটককার ব্রাত্য বসুর প্রথম পর্বের লেখা। কিন্তু সেখানেও নিজস্বতায় ও বিষয়-বৈচিত্র্যে নাটকগুলি স্মরণীয় হয়ে আছে। 'অশালীন' নাটকের পর লেখা 'অরণ্যদেব' নাটক। এই নাটকে এক অশান্ত ও জটিল ভবিষ্যতের গল্প বলা হয়েছে। 'মুখোমুখি বসিবার' নাটকটি আপাত মানব হৃদয়ের জটিলতা, প্রেম-অপ্রেমের নাটক। 'চতুষ্কোণ' লেখার সময় নাট্যকার ব্রাত্য বসুকে আরো বেশি পরিণত মনে হয়। মানুষের অবচেতনের মনের তাড়নায় এবং প্রবৃত্তির ফাঁদে পড়ে একটা মানুষ কি করে অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে তা বোঝা যায় 'চতুষ্কোণ' পড়লে। 'শহর ইয়ার' নাটকটি অপেরাধর্মী। 'ভাইরাস এম', 'উইঙ্কল-টুইঙ্কল' একেবারেই সমকালীন সময়ের বাস্তবতাকে নিয়ে লেখা। 'বাবলি' নাটকটিতেও সময় ও প্রেম মিশে আছে। 'মৃত্যু, ঈশ্বর, যৌনতা' নাটকটি লেখার ধরন আমাদেরকে চমকে দেয়। সকাল-বিকাল ও রাত্রি এই তিনটি সময়কে বিচিত্র ব্যঞ্জনায় চিহ্নিত করা হয় এই নাটকে। নাটককার ব্রাত্য বসুর নাটক সমগ্রের দ্বিতীয় খণ্ডের নাটকগুলিতে প্রকাশ পায় সমকাল চেতনা এবং গভীর রাজনীতিবোধ। 'পেজ ফোর- ইটস্ অলসো আ গেম', 'হেমলাট- দ্য প্রিন্স অব গরানহাটা', 'বাবরের প্রার্থনা' নাটকগুলিতে সমসময়ের অভিঘাত দৃঢ়ভাবে চোখে পড়ে। 'দর্জি পাড়ার মর্জিনারা', 'রুদ্ধ সঙ্গীত' হল ফেলে আসা সময়ের জীবন্ত দলিল। 'কৃষ্ণগহ্বর', 'ভয়', 'বিকেলে ভোরের সর্ষে ফুল' মানুষের একাকীত্বের গল্প শোনায়। ব্রাত্য বসুর রচিত ছোটো নাটকগুলির স্বল্প পরিসরের মধ্যে জীবনের গূঢ় তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন করে। ২০১১-২০১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ব্রাত্য বসু বারোটি নাটক লেখেন। এই সময়ের নাটকগুলির মধ্যে তীব্র পরিণত বোধ, রাজনীতি চেতনা, সম্পর্কের টানাপোড়ন লক্ষ করা যায়। প্রেম,

প্রতিহিংসা যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এই নাটকগুলির শিরা-উপশিরায়। 'সুপারি কিলার', 'আলতাফ গোমস্', 'সিনেমার মতো', 'কে', 'আনন্দীবাঈ', 'ফোর্থ বেল' প্রতিটি নাটকে বিষয়-বৈচিত্র্যে এবং জীবনবোধের প্রকাশে স্বতন্ত্রতার দাবি করে। 'জতুগৃহ', 'বোমা' অথবা 'ইলা গূঢ়ৈষা' পুরনো সময়ের কথা বললেও তা আজও প্রাসঙ্গিকতা বহন করে। আমার সমগ্র গবেষণায় তাই ব্রাত্য বসুর নাটক সমগ্রের অন্তর্গত আটত্রিশটি নাটকের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে নাটককার ব্রাত্য বসুর নাট্যকৃতি ও স্বতন্ত্রতা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ব্রাত্য বসু বাংলা নাট্যসাহিত্যে এক ব্যতিক্রমী নাট্যকার। তাঁর নাটকের বিষয়, সংলাপ, চরিত্র ও জীবনের দ্বন্দ্ব জটিলতা, রাজনৈতিক, সামাজিক সমস্যা ও সমাধান, প্রেম, যৌনতা সবমিলিয়ে নাটকের পরতে পরতে সাজানো রয়েছে নাটককারের জীবনবোধ। এই সময়ের সব থেকে বলিষ্ঠ নাটককার ব্রাত্য বসুকে নিয়ে গবেষণার কাজ খুব কম হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক রজত দত্ত ব্রাত্য বসুকে নিয়ে এম.ফিল-এর কাজ করেছেন। রজতবাবু বিষয় হিসেবে ব্রাত্য বসুর তিনটি নাটককে বেছে নিয়েছেন। নাটকগুলি হল— 'উইঙ্কল-টুইঙ্কল', 'ভাইরাস এম' এবং 'সতেরোই জুলাই'। রজতবাবুর এম.ফিল-এর শিরোনাম ছিল— 'ব্রাত্য বসুর নাটকে সমসময়ের অভিঘাত'। এছাড়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শেখর সমাদ্দারের অধীনে বর্তমানে ব্রাত্য বসুর নাটক নিয়ে এম.ফিল-এর কাজ হচ্ছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে শ্রাবণী দাসের এম.ফিল -এর বিষয় হল— 'ব্রাত্য বসুর নাটকে সময়ের সাথে সম্পর্ক'। এছাড়া ব্রাত্যজনের নাট্য পত্রিকায় ব্রাত্য বসুর নাট্য প্রতিভা নিয়ে অসংখ্য লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে ব্রাত্য বসুকে নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত হয়ে চলেছে। এছাড়া ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে 'অসময়ের নাট্যভাবনা' পত্রিকার শারদ সংখ্যার নাম ছিল— 'মঞ্চের মুখ ব্রাত্য'। এছাড়া অবেলা, আজকাল, বর্তমান, সংবাদ প্রতিদিন, এই সময়, আনন্দবাজার পত্রিকা, অন্যসময় পত্রিকা, দ্য ক্যালকাটা টাইমস্, দ্য টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া, পূর্ব-পশ্চিম নাট্যপত্র, রিভিউ-প্রিভিউ, আনন্দলোক, সুখী গৃহকোণ

পত্রিকা, নাট্যমুখ নাট্যপাত্র, ভাষানগর প্রভৃতি পত্র এবং পত্রিকায় ব্রাত্য বসুর নাটক নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

বাংলা নাটকের ধারায় ব্রাত্য বসু এক স্বতন্ত্র স্থানের অধিকারী। গেরাসিম লেবেদফের হাত ধরে যে বাংলা নাটকের যাত্রা শুরু হয়েছিল অনেক ঘাত-প্রতিঘাত দিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলা নাটক আজ বিশ্বের দরবারে নিজের স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে। একটা সময় ছিল যখন শুধুমাত্র ইংরেজি অথবা সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করে সেই নাটক অভিনীত হতো। এরপর এল ভক্তিরসাত্মক নাটক বা সামাজিক নাটক। এই নাটকগুলিও বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করলো। পরাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতার চেতনা বৃদ্ধির জন্য স্বদেশী নাটকগুলির অবদানও অনস্বীকার্য। এরপর ধীরে ধীরে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে মানুষের মন ও মানসিকতার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করলো। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে খণ্ড হল, দেশভাগের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বাঙালি আবার বাঁচার লড়াই শুরু করলো। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত ছাপোষা মানুষের জীবনযন্ত্রণা ক্রমশ গাঢ় হয়ে উঠলো সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় নাটকও তার ব্যতিক্রম নয়। গণনাট্য, নবনাট্য ধারা পার করে বাংলা নাটকে মোহিত চক্রবর্তী, বাদল সরকার, মনোজ মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের আগমন। এঁদের হাতে বাংলা নাটক এক গৌরবময় স্থান অধিকার করেছিল। এর পরবর্তী সময়ে সাময়িক শূন্যতার পর বাংলা নাটকের অঙ্গনে নাটককার ব্রাত্য বসুর আবির্ভাব। ব্রাত্য বসু এমন একজন নাটককার যাঁর লেখা নাটকগুলি মঞ্চসফল আবার রচনাতেও রয়েছে সাহিত্যরস। তাঁর রচিত নাটকগুলি বিশিষ্ট বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাওয়ার যোগ্য। এই নাটকগুলির মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে সময়। আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া নতুন সময়, আমাদের ফেলে আসা নতুন সময়। তারা স্বল্প ব্যবধানেই স্থান বদল করছে। কথা বলেছে কখনো বহুমুখী আবার কখনো স্বাগত সংলাপের মধ্য দিয়ে। বিষয়ের প্রাচুর্যেও ব্রাত্য বসুর নাটক অনন্য। প্রকৃতপক্ষে ব্রাত্য বসুর নাটকেই আমরা অর্থাৎ এই সময়ের আমরা নিজেদের সুখ-দুঃখ, প্রেম, কামনা-ব্যর্থতা, হিংসা, লোভ, পাপ সবটা

দেখতে পাই। নিজেদের বারবার ছিন্নভিন্ন করে সেই টুকরোগুলোকে নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেখতে পাই আমাদের সত্তাকে।

ব্রাত্য বসুর জন্ম ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর। শিক্ষা গ্রহণ করেছেন বাঙ্গুর স্কুল থেকে এবং পরবর্তী সময়ে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। ব্রাত্য বসু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ। তিনি কলকাতার সিটি কলেজে বাংলার অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন। ব্রাত্য বসুর পিতা বিষ্ণু বসু একজন অধ্যাপক, প্রাবন্ধিক এবং প্রাজ্ঞ মানুষ। তাঁর সুযোগ্য পুত্র ব্রাত্য বসু বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি একদিকে এই সময়ের শ্রেষ্ঠ নাটককার, অন্যদিকে তিনি সফল অভিনেতা এবং সফল চিত্র পরিচালক। প্রাবন্ধিক হিসেবেও ব্রাত্য বসু বাংলা গদ্য সাহিত্যের ধারাতে স্বতন্ত্র স্থান দখল করে আছেন। তিনি নাটক লেখা শুরু করেন বিংশ শতকের একেবারে শেষ লগ্নে। এই সময় গ্রুপ থিয়েটারের আদর্শকে পাথেয় করে বহুরূপী, নান্দীকার, নান্দীমুখ সহ আরো অনেক দল নাট্যচর্চার কাজে নিয়োজিত। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত, শাঁওলি মিত্র, ঊষা গাঙ্গুলিদের পরবর্তী উত্তরসূরি হিসেবে মঞ্চে কাজ শুরু করেছেন— দেবশংকর হালদার, গৌতম হালদার, প্রবীর গুহ, চন্দন সেন, শেখর সমাদ্দার সহ আরো অনেক প্রতিভাশালী নাট্যব্যক্তিত্ব। কিন্তু এত অভিনেতা-অভিনেত্রীর ভিড়ে নাটককারদের অভাব দেখা দিয়েছিল। সময়োপযোগী নাটক লেখার ক্ষেত্রে একটা শূন্যস্থান তৈরি হয়েছিল বাংলা নাটকের জগতে। এই সময়ের চাহিদা নিয়ে রচিত নাটকের অভাবকালেই ব্রাত্য বসুর নাটক লেখা শুরু। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে ওঁনার লেখা প্রথম নাটক ‘অশালীন’। দুটো শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে এসে ব্রাত্য বসুর প্রথম নাটকের বিষয় হল ভাষার শালীনতা-অশালীনতা। এমন বিষয় সকলকে চমকে দেওয়ার মতোই। এরপর ওনার নাটক লেখার স্রোত কখনো থেমে থাকেনি। আজও যা অব্যাহত কখনো বিষয়ে নির্বাচনে কখনো চরিত্র মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে ব্রাত্য বসুর নাটক প্রাসঙ্গিক ও চিরন্তন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নাটকের বিষয়ই হল নাট্য শরীর। বিষয় নির্বাচনে নাট্যকারের জীবনদর্শন ও বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। বিষয়-বৈচিত্র্য ব্রাত্য বসু স্বতন্ত্র ধারার লেখক। এক শতাব্দী থেকে অন্য শতাব্দী যাত্রার মাঝখানের সময়ে ব্রাত্য বসুর নাটক লেখা শুরু। এক উথাল-পাথাল সময়ের সাক্ষী তাঁর নাটকগুলি। নতুন মিলেনিয়ামে প্রবেশ। নতুন মানসিকতা, কম্পিউটার ইন্টারনেটের যুগে মানুষের একা হয়ে যাওয়ার গল্প, অথবা পুরনো সময়কে আঁকড়ে বাঁচার প্রচেষ্টা সবটাই ধরা পড়ে। ব্রাত্য বসুর নাটকের বিষয়ে আবার ভবিষ্যতের মানুষ কেমন হবে তারও আন্দাজ পাই নাটকের বিষয়ের ঘেরাটোপে।

সময়ের দাবি অস্বীকার করার ক্ষমতা আমাদের নেই সাহিত্যের প্রত্যেকটি শাখায় সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সময় নিরবয়ব। সময় মানুষকে ক্রমাগত সমৃদ্ধ করে তোলে, সৃজনশীল মানুষ অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়। একজন সচেতন সাহিত্যিক বা নাটককার তাঁর সময়কে চারপাশের বদলে যাওয়া সময়কে ধরে রাখেন তাঁর রচনায়। ব্রাত্য বসুর রচিত নাটকগুলিতে এর ব্যতিক্রম হয়নি। তাঁর নাটকে সময় এসেছে কখনো একেবারে মুখ্য ভূমিকা নিয়ে আবার কখনো চরিত্র বা ঘটনার অন্তরালে লুকিয়ে। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ তিন সময়ের প্রেক্ষাপটে ঘোরাফেরা করেছে তাঁর নাটকের বিষয় এবং নাটকের চরিত্ররা। 'বোমা', 'রুদ্ধ সঙ্গীত', 'ইলা গূঢ়ৈষা', 'জতুগৃহ' প্রভৃতি নাটকে অতীতের সময়কে ধরা হয়েছে। আবার 'অরণ্যদেব', 'সময়যান' প্রভৃতি নাটকে দেখানো হয়েছে ভবিষ্যতের সময়কে। নাটককার ব্রাত্য বসু তাঁর গভীর জীবনবোধ ও অনুভূতির তীব্রতার দ্বারা অনুধাবন করেছেন অচেনা অদেখা এক সময়কে সেই সময় এখনো আসেনি কিন্তু ভবিষ্যতে একদিন নিশ্চয়ই আমরা সেই সময়ের মুখোমুখি হবো। তবে অতীত এবং ভবিষ্যৎ ছাড়া আর যে সময়ের ফ্রেম ধরা পড়েছে ব্রাত্য বসুর নাটকগুলিতে তা হল বর্তমান সময় বা সমকাল। তাঁর নাটকে সমকাল চেতনা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যে অস্থির সময়ের মধ্যে বাস করছি সেই সময়ের প্রতিফলন মেলে ব্রাত্য বসুর অনেকগুলি নাটকে। 'চতুষ্কোণ', 'শহর ইয়ার', 'উইঙ্কল-টুইঙ্কল', 'সুপারি কিলার', 'আলতাফ গোমস্', 'সিনেমার মতো',

‘কৃষ্ণগহ্বর’, ‘ভয়’, ‘পেজ ফোর’ ইত্যাদি বেশিরভাগ নাটকেই অবক্ষয়িত সময় এবং সময়ের দংশনে ক্ষতবিক্ষত মানব মনের কথা বলা হয়েছে।

ব্রাত্য বসু বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি প্রথম জীবনে কলেজে পড়াকালীন ছিলেন আপাত কবিতাপ্রেমী এক লাজুক যুবক। সেই সময় তিনি ছিলেন বাংলা কবিতা সহ সাহিত্যের নিবিড় পাঠক। তার প্রায় এক দশক কেটে যাওয়ার পর অর্থাৎ ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর গণকৃষ্টি কলকাতা দল মঞ্চস্থ করে ব্রাত্য বসুর প্রথম নাটক ‘অশালীন’। এই সময় ব্রাত্য বসু সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়েছেন। তাই তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ ও মতবাদ তাঁর নাটকে প্রতিফলিত হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ব্রাত্য বসু প্রতিভাশালী শিল্পী তাই তাঁর নাটকে রাজনীতি প্রবেশ করেছে অনিবার্যভাবে। কখনো মনে হয় না যে রাজনৈতিক সুড়সুড়ি দেওয়ার জন্য জোর করে রাজনীতি আরোপিত হয়েছে। আসলে আমরা জন্ম থেকেই আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে সভ্যতার সূচনাকাল থেকেই রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছি। সেই রাজনীতি বাড়ির চার দেয়ালের ভেতরেও রয়েছে। আবার স্কুলের কলেজের ক্লাসরুমে রয়েছে আবার কলেজের গণ্ডি পার করে যখন আমরা বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ করি তখন অনিবার্যভাবে আমাদের জীবনে রাজনীতি প্রবেশ করে। ব্রাত্য বসুর রচিত বিভিন্ন নাটকে যেমন— ‘মে দিবসের লাটক’, ‘কমরেড কথা’, ‘কালান্তক লালফিতা’, ‘উইঙ্কল-টুইঙ্কল’, ‘অপারেশন ২০১০’, ‘আলতাফ গোমস্’ সহ আরো কয়েকটি নাটকে সরাসরি আমরা প্রচ্ছন্নভাবে রাজনীতির কথা এসেছে। কারণ বেঁচে থাকতে হলে অস্তিত্বের সংগ্রামে টিকে থাকতে গেলে, যোগ্যতমের উদ্বর্তনবাদকে মাথায় রাখলে রাজনীতিকে অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই। রাজনীতি অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে ব্রাত্য বসুর নাটকের প্রেক্ষাপটে অথবা চরিত্রের ভাবনায় বা বিষয়-বৈচিত্র্যে।

নাটক তখনই দর্শকের কাছে পৌঁছায় যখন তার মধ্যে চরিত্রগুলো সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়। ব্রাত্য বসু নাটকে তাঁর চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভেতরের মানুষটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আসলে বাইরের মানুষ সমাজের শেখানো নিয়মকানুন মেনে, সভ্যতার মোড়কে

নিজেকে ঢেকে চলাফেরা করেন। এভাবে দেখলে পুরো মানুষটাকে ধরা অথবা ছোঁয়া যায় না। কিন্তু ব্রাত্য বসু সমগ্র চরিত্রের ছবি এঁকেছেন তাঁর প্রতিটি নাটকে। লোভ-লালসা, কাম, ক্রোধ, প্রেম, প্রতিহিংসা, ব্যর্থতা সবটা নিয়ে মানুষ। আমাদের চেতন মনের আড়ালে বাস করছে অবচেতন মন, সেখানে প্রতিনিয়ত চলে নানা ভাঙা-গড়া। মনের সেই গোপন গহীনে ডুব দিয়ে ব্রাত্য বসু তুলে এনেছেন তাঁর নাটকের চরিত্রগুলিকে। সেই চরিত্রগুলি আমাদের এই সময়ের ফসল। মুখের সামনে আয়না ধরার মতো নাটকের চরিত্রগুলো চলে ফিরে বেড়ায় এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। আসলে নাট্যকার ব্রাত্য বসু তাঁর নাটকে নিজের সত্তাকে যেমন বারবার ভেঙেচুরে আমাদের সামনে এনেছেন তেমনই চরিত্রগুলোকেও চেতন-অবচেতনের গণ্ডি পার করে উপস্থাপিত করেছেন নাটকে। 'অশালীন'-এর সুজন, 'আলতাফ গোমস্'-এর আলতাফ, 'মুখোমুখি বসিবার'-এর সন্দীপ, 'হেমলাট দ্য প্রিন্স অব গরানহাটা'-এর হেমলাট, 'কৃষ্ণগহ্বর'-এর অংশুমান অথবা 'ইলা গুঁড়েষা'-এর বীরনারায়ণ সমস্ত চরিত্রগুলি আপাতদৃষ্টিতে আলাদা আবার মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে অথবা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে কোথায় যেন এক সারিতে অবস্থান করে। তাই ব্রাত্য বসুর নাটকের চরিত্রগুলি বাংলা সাহিত্যের অমর সৃষ্টি।

নাটকের দেহ বা শরীর যদি হয় বিষয় তাহলে সেই শরীরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় সংলাপের মাধ্যমে। নাটকের ভাষা হল সংলাপ। সেই সংলাপ কখনো চরিত্র উচ্চারণ করে আবার কখনো তা অনুচ্চারিত হয়ে থাকে। স্বগতোক্তির মাধ্যমে তা দর্শকের কাছে এসে পৌঁছায়। ব্রাত্য বসুর অন্তরে যে এক কবিসত্তা বাস করে তা তাঁর নাটকের সংলাপ পড়লে বোঝা যায়। শুধুমাত্র মঞ্চসফল নাটক হিসেবে নয়, সাহিত্য হিসেবেও নাটকগুলি তাই অত্যন্ত মূল্যবান। নাটকের সংলাপ বা ভাষা ব্রাত্য বসুকে সমসাময়িক নাট্যকারদের থেকে স্বতন্ত্রতা দান করেছে। ব্রাত্য বসুর ভেতরকার কবিত্ব নাটকের সংলাপে ছড়িয়ে পড়েছে। 'মুখোমুখি বসিবার', 'শহর ইয়ার', 'মৃত্যু-ঈশ্বর-যৌনতা', 'দর্জি পাড়ার মর্জিনারা', 'বাবরের প্রার্থনা', 'আপাতত এইভাবে দুজনের দেখা হয়ে থাকে' প্রভৃতি নাটকের সংলাপে কবিতা সৌন্দর্য ও

ছন্দ যেন অদৃশ্যভাবে মিশে রয়েছে। ব্রাত্য বসুর লেখা ছোটো নাটকগুলোর সংলাপেও কবিত্ব মিশে রয়েছে।

ব্রাত্য বসু বাংলা নাট্যসাহিত্যে একটি প্রতিষ্ঠান স্বরূপ। কবি ব্রাত্য বসু, অভিনেতা ব্রাত্য বসু, রাজনৈতিক ব্রাত্য বসু, প্রাবন্ধিক ব্রাত্য বসু, নির্দেশক ব্রাত্য বসু এবং নাটককার ব্রাত্য বসু সব মিলিয়ে তাঁর অবাধ বিচরণ আমাদের সকলের মনের মণিকোঠায়। শুধু বাংলা নাট্যসাহিত্যে নয় নাটককার হিসেবে সারাদেশে এমনকি দেশের বাইরেও তিনি পরিচিত। ১৯৯৬-২০১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে তিনি নাটককার হিসেবে আটত্রিশটি নাটক লিখেছেন যা আমাদের সম্পদ। এক জটিল সময়ের প্রেক্ষাপটে যুগ ও জীবনকে তুলে ধরার সত্যনিষ্ঠ প্রয়াসে ব্রাত্য বসুর ভূমিকা অনস্বীকার্য। নাটকের স্ক্রিপ্ট যখন সাহিত্য হয়ে ওঠে তখন তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায় এক বৃহৎ পাঠকসমাজ। ব্রাত্য বসুর নাটকগুলি শুধুমাত্র নাটকের কলাকুশলীদের জন্য লেখা হয়নি নাটকগুলির আবেদন সর্বজনীন। নাটকগুলি প্রযোজনার দিক থেকে যেমন মঞ্চসফল তেমনই এই নাটকগুলো পাঠ করে সাহিত্যরস আস্বাদন করা যায়। অসাধারণ কাব্যনির্ভর ভাষা, সংলাপ, চরিত্র সৃষ্টিতে মৌলিকত্ব, লিবিডোর প্রকাশ তাঁর নাটককে সমৃদ্ধ করেছে প্রতিনিয়ত। এছাড়াও বলিষ্ঠ অণুনাটক বা ছোটো নাটকের রচয়িতা ব্রাত্য বসু।